উপনিবেশ আমলে বাংলা ভাষা-পরিকল্পনার স্বরূপ : বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' অবলম্বনে একটি পাঠ

মোহাম্মদ আজম*

The essay 'Bangla Bhasha' (Bengali Language) by Bankimchandra Chatterjee was first published in 'Bangadarshan', Joistho 1285 issue. In those days, an ongoing debate by the scholars on the acceptable style' of Bengali prose was brought out in different magazines and periodicals. In this debate, there were, generally two groups— one was 'Sanskritpanthi' (proponent of Sanskrit) which according to Bankim, was 'Prachinponthi'(backward looking) group; and the other was 'Banglapanthi' (proponent of Bengali) who, according to Bankimchandra was 'Nabyapanthi' (New group). Bankimchandra asserted that it is auspicious to adopt the 'middle-path' by way of setting aside the advice of the both groups— old and new. The Language analysts of later generation, almost without any exception, looked at this 'claim' with a gesture of appreciation. In this article we try to grasp the nature and characteristics of Bankim's 'middle path'.

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শনে', ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। সেকালে বাংলা ভাষার 'গ্রহণযোগ্য' রীতি সম্পর্কে নানাজনের মতামত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। এই বিতর্কের একদিকে ছিলেন সংস্কৃতবাদী বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় প্রাচীনপন্থিদের দল, আর অন্যদিকে ছিলেন কারো কারো মতে 'বাংলাপন্থি' আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় নব্যপন্থিদের দল। বঙ্কিমচন্দ্র দাবি করেছেন, নব্য ও প্রাচীন উভয় দলের পরামর্শ বাদ দিয়ে ভাষার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই কল্যাণকর। তাঁর এই দাবিকে উত্তরকালের ভাষাবিশ্লেষকরা প্রশংসার চোখে দেখেছেন। আমরা এই লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মধ্যপন্থা'র স্বরূপ বুঝতে চাইব।

'ভাষা-পরিকল্পনা' কথাটি এ লেখায় আমরা খুব সরল ও প্রচলিত অর্থে, বিশেষত 'অবয়ব পরিকল্পনা' অর্থে ব্যবহার করেছি। 'উপনিবেশ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া (colonization process) বোঝাতে। অর্থাৎ নিছক শাসক ও শাসনপ্রণালির পরিবর্তন হিসাবে না দেখে সময়টিকে ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর থেকে বদলে যাওয়ার বাস্তবতায় দেখা।

আমাদের দাবি : রাষ্ট্র, সমাজ, উন্নতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি দশ ব্যাপারের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও উপনিবেশ আমলের বাস্তবতা থেকে আজকের বাস্তবতার বিশেষ হেরফের হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভাষাপ্রশ্নে আমাদের লাভ-লোকসানের আংশিক হিসাবও আমরা এখানে নেয়ার চেষ্টা করব।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি সরল, সংক্ষিপ্ত ও উদ্দেশ্যমুখী। সেকালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিভাবক এবং উঁচুমানের সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সমকালীন ভাষা-পরিস্থিতি বুঝতে চেয়েছেন, নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

প্রথমেই বলেছেন, লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষার প্রভেদ সব ভাষারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই ভেদ যতটা, অন্য ভাষায় ততটা নয়। এই বিপুল ফারাকের জন্য প্রধানত সংস্কৃতপন্থিরাই দায়ী। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সংস্কৃতপন্থিদের অতিরিক্ত আকর্ষণের কারণেই বাংলা ভাষা দুর্বোধ্য, নীরস, শ্রীহীন ও দুর্বল হয়ে উঠেছে। লিখিত বাংলার এই দুর্দশায় কুঠারাঘাত করে আবির্ভূত হলেন টেকচাঁদ ঠাকুর। লোকের কথোপকথনের ভাষায় রচনা করলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। বঙ্কিমের ভাষায় : 'সেইদিন হইতে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'

এর ফলে বাংলা ভাষার সমালোচকেরা দুই দলে বিভক্ত হলেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতপন্থি, অপর সম্প্রদায় 'বাঙ্গালা সমাজে' অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের বিরোধী। প্রথম দলের মুখপাত্র স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র রামগতি ন্যায়রত্নের মত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ন্যায়রত্ন অকারণে সরল শব্দ পরিহার করতে চান। তাছাড়া ন্যায়রত্ন যে যুক্তিতে আলালি ভাষার নিন্দা করেছেন, তা 'বাল্যসংস্কার' ও অজ্ঞতাপ্রসূত। বিপরীতদলের প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে, বলেছেন যে বাংলা ভাষার উপর তিনি অনেক 'দৌরাত্ম্য' করেছেন। তবুও শ্যামাচরণের মত অনেক সারগর্ভ এবং বাংলা ভাষার লেখকদের জন্য উপকারী।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ, অরূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন শব্দ সম্পর্কে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, অরূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ – যেগুলো বাংলায় প্রচলিত হয়ে গেছে – পরিহার করার দরকার নেই, পরিহারের উপায়ও নেই। ঠিক তেমনি রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ আর সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করারও কোনো কারণ নেই। তাঁর মতে, সংস্কৃতপন্থিরা নিতান্ত মূর্খতার বশেই এই দুই শ্রেণীর শব্দ বাদ দিতে চান। আর নতুন শব্দের দরকার হলে সংস্কৃত থেকে কর্জ করাই উত্তম।

প্রবন্ধের পরের অংশে সাহিত্যিক ও জ্ঞানপ্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মত প্রকাশ পেয়েছে। দশ জনে যে ভাষা বুঝে, সে ভাষায় গ্রন্থ রচনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সিদ্ধান্ত দিয়েছেন : 'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত'। সরলতা ও স্পষ্টতার প্রয়োজনে যে কোনো শ্রেণীর শব্দই নিঃসংকোচে গ্রহণ করা কর্তব্য। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করে এই রীতি অবলম্বন করলেই, তাঁর মতে, 'ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা, এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।'

২

সমকালীন বাংলা গদ্যরীতির যে বিভাগ বঙ্কিম করেছিলেন তা নতুন নয়, অভাবনীয়ও নয়। আগে ও পরে বাংলা গদ্যের এই দ্বৈরথ আরো অনেকেরই নজরে পড়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' নামের প্রবন্ধে জন বীম্‌স্ লিখেছিলেন :

> এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। এক দল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন। (আজাদ ২০০১ : ৩৪৪)

এই বিবৃতির স্বর-লয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের প্রস্তাবের মিল মোটেই আপতিক নয়। তবে এ বিষয়ে আমরা পরে আসব। আগে অন্য ধরনের বিভাজনের কিছু খবর নেয়া যাক।

রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই বাংলা গদ্যের দুই পৃথক শৈলী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গদ্যগ্রন্থ রচনার আগের বাংলা গদ্যের যে বিপুল সমাহার পাওয়া গেছে, তাতেও এই দুই শৈলী পরিষ্কারভাবে শনাক্ত করা যায়। এই দুই রীতির প্রধান পার্থক্য ছিল শব্দ ব্যবহারে। সাধুরীতিতে তৎসম-তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য ছিল। আর রামমোহন রায় যাকে বলেছিলেন 'আলাপের ভাষা', এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বলেছিলেন 'লৌকিক ভাষা', তাতে ছিল আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য। প্রথমটি ছিল মূলত ধর্মীয় বিষয়াদির ভাষা, আর দ্বিতীয়টি প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ভাষা। (মুরশিদ ১৩৯৯ : ২৩)

অবশ্য ভাষারীতির অন্য ধরনের ভাগও কেউ কেউ করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা' নামের প্রবন্ধে গ্রাড়ুএট ছদ্মনামে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন :

> আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিনপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা চলিত ছিল। ...মোটামুটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাঙ্গালা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত। (শাস্ত্রী ২০০০ : ৫৬২)

এসব বিভাজনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভাজনের তুলনা করলে দেখব, বঙ্কিমচন্দ্র মূলত লেখার ভাষার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রেখেছেন। লিখেছেন : 'যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।' কিন্তু সেক্ষেত্রে লিখিত ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার সম্পর্ক কীরূপ হবে, তা তাঁর আলোচনায় গুরুত্ব পায়নি। তিনি ভাষাকে মূলত সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবেই দেখেছেন, জীবনের সর্বপরিসরে ব্যাপ্ত উপাদান হিসাবে নয়। এই দেখার মধ্যে তাঁর মনের গড়ন ও শ্রেণী-চরিত্র পরিষ্কার পাঠ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে নতুন ইংরেজি-শিক্ষিত বাংলা লিখিয়েদের গদ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু কারো কারো রচনায় এদের উল্লেখ পাই। যেমন শাস্ত্রী তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন :

> সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরেজিওয়ালারাও লেখনী ধারণ করিলেন। বাঙ্গালায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরেজিওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরেজিতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। নতুন কথা তাঁহাদের গড়ার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজ ভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক তাহা না থাকায় সময়ে সময়ে বড়ই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। (শাস্ত্রী ২০০০ : ৫৬৪)

তিনি অন্যত্র লিখেছেন: 'আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরেজী, ভাবেন ইংরেজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায় – সে একরকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে'। (আজাদ ২০০১ : ৩৮৩) বলা দরকার : এই সাহেবি বাংলা বিশেষ রকম উৎকট আর ভুলে ভরা সংস্কৃত বাংলাই বটে। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বাংলা রচনায় উৎকট সংস্কৃত শব্দ আমদানির দায় থেকে এই গোষ্ঠীটিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। তাদের কথা উল্লেখ না করে পুরা দায়দায়িত্ব চাপিয়েছেন সংস্কৃতপন্থিদের ঘাড়ে।

কোনো রচনায় যা বাদ পড়ে তাও রচনা সম্বন্ধে আলবৎ কথা বলে। তবে আমরা প্রথমে এই প্রবন্ধে যা আছে তার বিশ্লেষণ করব।

৩

দেখা যাচ্ছে, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হিসাবে সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়কে সাব্যস্ত করেছেন। প্রবন্ধের নানা জায়গায় তিনি এঁদের 'কৃতকর্মে'র নিন্দা করেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা তাচ্ছিল্যের সুরে। সংস্কৃতপন্থিদের মুখপাত্র স্বরূপ নেয়া রামগতি ন্যায়রত্নও তাঁর তাচ্ছিল্যের সহজ শিকার। বঙ্কিমচন্দ্রের দিক থেকে এই তাচ্ছিল্যের কারণ খুব পরিষ্কার : 'ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত কিন্তু ইংরেজি জানেন না – পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে'। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য অন্য আরেক কারণ নির্দেশ করেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, সেই হেতু বিদ্যাসাগরের শিষ্য রামগতি বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে পাশ্চাদপদ হননি। পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম সেগুলি সংশোধিত করে না নিলেও তাঁকে কারণে অকারণে কটাক্ষ করেছেন'। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১, পৃ. ট)

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) সংস্কৃত কলেজের উপাধি পাওয়া বিখ্যাত ছাত্র এবং পরে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃতী শিক্ষক। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সম্ভবত সেই পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র বা সমকালীন কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত অন্য কারো কারো মতো গভীর ছিল না। অনুবাদসহ অন্য আরো কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করলেও 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'ই তাঁর প্রধান কীর্তি। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের আগে ন্যায়রত্নের বইটি ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বিস্তারিত ইতিহাস।

এসব কথা মনে রাখলে বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়রত্নকে যেভাবে তাচ্ছিল্য করেছেন, সাধারণভাবে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ কারণ নাই বলেই গভীর কারণ খুঁজে দেখা দরকার।

ন্যায়রত্নের প্রায় পৌনে চারশ পৃষ্ঠার বই থেকে বঙ্কিমচন্দ্র একটিমাত্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। সে অংশে ন্যায়রত্নের মত এই যে আলালি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা অনুচিত। কারণ : 'আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নয়'। জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাট্টা-বিদ্রূপের বান বইয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : 'তিনি যে বলিয়াছেন যে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসংকুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'

একটু সতর্কতার সাথে বিচার করলেই বোঝা যায়, ন্যায়রত্নের মত উপস্থাপন ও তার সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র মস্ত চালাকির আশ্রয় নিয়েছেন। দুই কারণে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। প্রথমত, সামগ্রিক ভাষা-পরিকল্পনায় আলালি ভাষার যে মর্যাদা (Status) ন্যায়রত্ন স্থির করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে তা থেকে একবিন্দুও বেশি মর্যাদা দেননি। দ্বিতীয়ত, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে লিখিত ভাষা সম্পর্কে ন্যায়রত্নের যে মতের প্রতিফলন পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের মত থেকে তা মোটেই ভিন্ন নয়। তাঁদের নিজ নিজ জবানিতেই কথাগুলো পেশ করছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। ... হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।
>
> টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। ... গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেননা এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল, এবং অপরিমার্জ্জিত।

বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমি ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে না পারায় পরবর্তীকালে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সেটা স্বাভাবিক। কারণ, হুতোমি ভাষা সমকালে যথার্থ মহিমা পেলে বাংলা গদ্যের মূর্তি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনায় অধিকতর মনোযোগ দাবি করে টেকচাঁদি ভাষা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত। একটি 'দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত' ভাষা কীভাবে সবল ও মার্জিত হয়ে ওঠে, তার আলোচনায় বঙ্কিম যাননি। যেতে চাননি। এমনকি এই ভাষা সম্পর্কে প্রবন্ধের গোড়ায় তিনি যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন তার দায়িত্বও তিনি নেননি। আলালি ভাষা কীভাবে বাংলার 'শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত' করল, তার কোনো হদিশ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে ন্যায়রত্নের লেখা থেকে যে অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার পরের অংশেই ন্যায়রত্ন লিখেছেন :

> আমাদের বিবেচনায় হাস্য পরিহাসাদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপদ হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১: ২৫৯)

এই মন্তব্যে আলালি ভাষা সম্পর্কে ন্যায়রত্নের যে বিবেচনা প্রকাশ পেয়েছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে একবর্ণও পৃথক নয়। তিনি যে লিখেছেন, 'বিষয় অনুসারে রচনার ভাষার উচ্চতা বা সমান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত' – সে কথার মান রক্ষিত হত, যদি তিনি কোন ভাষা 'উঁচু' আর কোন ভাষা 'সামান্য' তা স্থির করে না দিতেন। কিন্তু 'গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয় টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না' – ধরনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে তিনি কার্যত আলালি ভাষাকে খারিজ করে দিয়েছেন।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ লিখিত ভাষা সম্পর্কে দুজনের মতের তুলনা করা যাক। প্রবন্ধের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাঙ্ক্ষিত লিখিত রীতির একটা ছাঁদ এঁকে দিয়েছেন। এই অঙ্কনে সাহিত্যিক বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা আর কাণ্ডজ্ঞানের এক নিপুণ সমবায় আমরা লক্ষ করি। অংশটি পুরাপুরি উদ্ধৃতিযোগ্য। কিন্তু পাঠকের সঙ্গে এর পরিচয় আছে ধরে নিয়ে আমরা এখানে কেবল তাঁর সিদ্ধান্ত বাক্যটি আবার উল্লেখ করছি :

> নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা, এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

এ প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্নের মতের দুটি অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি :

> ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; একবিধ রচনা পাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনো মতেই সম্ভাবিত নহে – অতএব ভাষা মধ্যে নানা প্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ : ২৫৯)

এর পরপরই বীম্‌স্-এর আকাদেমি স্থাপনের বিখ্যাত প্রস্তাব (Treatment of the nexus পুস্তকে) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ন্যায়রত্ন লিখেছেন :

> বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ় স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দসকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিরূপে রচনার ব্যবস্থা করা কর্তব্য, তিনি উক্ত পুস্তকমধ্যেই নিজের, এই যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ : ২৫৯-৬০)

এই অনুমোদনের পর আমাদের না মেনে উপায় থাকে না যে, রামগতি ন্যায়রত্ন সমেত 'সংস্কৃতপন্থি' অন্য অনেক লেখকের প্রতি বঙ্কিমের রোষের কারণ তাঁদের মত নয়, বরং অন্য কিছু। সেই অন্য কারণটিও বঙ্কিম গোপন করেননি বা করতে চাননি – ইংরেজি ভাষা ও জ্ঞানে যথেষ্ট পরিপক্ব না হওয়াই সংস্কৃতপন্থিদের মূল গলদ। এর ফলে অবশ্য রুচি, শ্লীলতার ধারণা, সৌন্দর্যের বোধ ইত্যাদিতেও একটা গুরুতর পার্থক্য ঘটে গেছে। লক্ষণীয়, ন্যায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই ভাষার বিবেচনায় 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা' প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু দুজনের পার্থক্যও গুরুতর। ন্যায়রত্ন পুরোনো ভারতের শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধারণার মধ্যেই নিজের শ্লীলতার ধারণা খুঁজেছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় ধারণা ইউরোপীয় নৈতিকতা ও রুচির ছাঁদে রূপান্তরিত হয়ে এমন এক মূর্তি

পেয়েছে, যা তার আগের গড়নকে আর 'নিজ' বলে চিনতেই চাইছে না। ফলে দুজনের পার্থক্য কিছুতেই সংস্কৃত ভাষাপ্রীতিতে বা শব্দপ্রীতিতে নয়, খোদ নতুন সময়ের নতুন মূল্যমানে। আশীস নন্দীর সাক্ষ্য এ ব্যাপারে আমাদের সহায়ক হবে :

> (Bankim Chandra's) novels and essays were an attempt to marginalize the earlier model of critical Hinduism and suggest a new framework of political culture which projected into the Hindu past, into a lost golden age of Hinduism, the qualities of Christianity which seemingly gave Christians their strength.
>
> ... (and it was) grounded in reinterpreted sacred texts but in reality *dependent on core values borrowed from the colonial world view* and then legitimized according to existing concept of sacredness. (নন্দী ১৯৮৯ : ২২-২৩ 'বাঁকা হরফ আমাদের')

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন ছাঁচে কথাগুলো উপস্থাপন করতে না পারাই ন্যায়রত্নের সমস্যা। রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয়তা ও ভাষা-সাহিত্য প্রশ্নে ঔপনিবেশিক সমাজের প্রভাবশালী ডিসকোর্সে দখল না থাকার কারণেই ন্যায়রত্ন বঙ্কিমের প্রতিপক্ষ। কিন্তু মধুসূদনের সঙ্গে অন্য অনেক অমিল থাকলেও এই নতুন রুচির ক্ষেত্রে গভীর আত্মীয়তা তাঁর। সেই বিখ্যাত বাক্য কটি আবার স্মরণ করি : 'কাল প্রসন্ন – ইউরোপ সহায় – সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও – তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন'। এখানে 'ইউরোপ সহায়' কথাটাকে নিছক সময়কাল বা শাসনকাল হিসাবে না দেখে বিদ্যাবত্তার বিশেষ ধরন হিসাবে দেখলেই 'সাহেব' মধুসূদনের প্রতি বঙ্কিমের উচ্ছ্বাসের একটা কিনারা করা যাবে। পাওয়া যাবে 'কেবল' সংস্কৃত জানা ন্যায়রত্নদের প্রতি উন্নাসিক মশকারার হদিশও।

৪

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় আর তাঁর প্রবন্ধের বিস্তর প্রশংসা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসমন্বিত এবং আদরণীয়।' তবে শ্যামাচরণের অনেক মতই বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেননি। তাঁর ভাষায় : 'তিনি (শ্যামাচরণ) বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।' আমরা এখন সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসা ও নিন্দার স্বরূপ বুঝতে চাইব।

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের শিরোনাম Bengali, Spoken and written। Calcutta Review-র CXXX সংখ্যায় (অক্টোবর ১৮৭৭) ৩৯৫ পৃ.– ৪৪৭ পৃ. জুড়ে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। পরে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়াও লিখেছিলেন তিনি। একটু বর্ধিত আকারে মূল প্রবন্ধ ও এই প্রতিক্রিয়া (Appendix) ১৯০৬ সালে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। এর সবটাই ১৯২৭ সালে লন্ডনের Lutac & Co. কর্তৃক প্রকাশিত শ্যামাচরণের প্রবন্ধসংকলন Essays and Criticisms-এর প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে Appendix-সহ প্রবন্ধটি ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা আকাদেমি পত্রিকা' ৩-এ ছাপা হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় এই সংস্করণটি ব্যবহার করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণের মতের সমালোচনা করে লিখেছেন : 'বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ উহা তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি জনৈক লিখিতে দিবেন না। ত্ব-প্রত্যয়ান্ত এবং য-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা – একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুইশত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ... এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।'

জবাবে শ্যামাচরণ লিখেছেন[১] : 'আমার কিছু মত সম্পর্কে এখানে যা বলা হল তা লাতিনে যাকে বলে 'আর্গুমেন্টুম আদ ইয়েরেকুন্দিয়াম' (argumentum ad Verecundiam), তা ছাড়া কিছু নয়। বহুদিনের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি একটা বিশেষ সময়ের পাঠকের যে ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, এখানে তার সুযোগ নেয়া হয়েছে। আমার যুক্তির ধারেকাছেও তিনি ঘেঁষেননি।'

একই ধরনের অভিযোগ শ্যামাচরণ অন্য জায়গায়ও করেছেন। লিখেছেন : 'যা আমি বলি নাই, এমনকি আমার মনেও ছিল না, তা আমার নামে চালিয়ে দেয়া ঠিক হয় নাই'।

শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগগুলোর যেসব জবাব দিয়েছেন, তার কয়েকটি খুব সংক্ষেপে আমরা নিজেদের ভাষায় তুলে ধরছি :

i) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় সংস্কৃত থেকে আমদানি করা স্ত্রীপ্রত্যয়বাচক শব্দের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মুখবন্ধ স্বরূপ মুদ্রিত 'চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' তিনি নিজে আমদানি করা সম্বোধন কারক পরিহার করেছেন এই বলে যে, 'আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে 'ভগবন', 'প্রভো', 'স্বামিন', 'রাজকুমারি', 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এসকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।' শ্যামাচরণের যুক্তি হল : সংস্কৃত সম্বোধন পদ বাংলায় যদি অপ্রযোজ্য হয় তবে সম্বোধন পদের মতোই বহিরাগত আর অসুবিধাজনক সংস্কৃতকুলের স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলায় কেন অপ্রযোজ্য হবে না, তা তাঁর বুঝে আসছে না। কারণ, সম্বোধনের বিপক্ষে যতরকম যুক্তি দাঁড় করানো যায়, তার সব কটিই তো স্ত্রীপ্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

ii) শ্যামাচরণ অভিযোগ করেছেন, 'ত্ব-প্রত্যয়ান্ত এবং য-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না' বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপর রীতিমত অবিচার করেছেন। কারণ, ধ্বনি-আনুগ বানানের সমর্থক হিসাবে তিনি 'ত্ত' (tto) কে 'ত্ব' আকারে লেখার বিরোধিতা করেছেন মাত্র।

iii) সংস্কৃত থেকে সংখ্যাবাচক শব্দের আমদানি বাংলা ভাষাকে এক বিকট রূপের দিকে নিয়ে গেছে। যেমন, 'একশ আটষট্টিবারের সংস্করণ' না লিখে লেখা হয় 'অষ্টষষ্ঠ্যধিকশততম সংস্করণ'। এক্ষেত্রে শ্যামাচরণের যুক্তি হল, মোটামুটি 'চতুর্দশ' পর্যন্ত সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ বাংলায় মিশে গেছে। সেগুলো ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলিত পদ্ধতিতেই সংখ্যাবাচক শব্দ লেখা কর্তব্য।

iv) চালু শব্দ উচ্ছেদের অভিযোগের জবাবে শ্যামাচরণ কতগুলো গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। খোদ 'প্রচলিত' শব্দটিকেই তিনি তাঁর প্রশ্নের আওতায় এনেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা: কোনো লেখক একটা শব্দ ধার করে এনে তাঁর লেখায় ব্যবহার করলেই সে শব্দটাকে বাংলা ভাষার চালু শব্দ বলা যাবে কি না? তাছাড়া, যেসব শব্দকে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচলিত' অভিধা দিয়েছেন, সেগুলো বাংলাভাষী কোনো জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় গৃহীত হয়েছে কি না? তাঁর সিদ্ধান্ত বেশ সোজাসাপ্টা : কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত কি না তা যাচাইয়ের একমাত্র কষ্টিপাথর হল শব্দটি মুখের ভাষায় প্রচলিত হওয়া। তাঁর সিদ্ধান্ত হল : এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখিত অনেক শব্দকেই বাংলা ভাষার চালু শব্দ বলা যায় না।

বিপরীতে শ্যামাচরণ এ-ও খেয়াল করেছেন যে, প্রচলিত শব্দ উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় – বঙ্কিমচন্দ্রের এ দাবি অসার। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন : খুব প্রচলিত 'দস্তখত' শব্দটির বদলে আজকাল চালু হয়েছে 'স্বাক্ষর' – যার চল আগে ছিল না বললেই চলে। দুই অক্ষরের 'দুরবিন' শব্দটি বাদ দিয়ে শুদ্ধতাবাদীরা এনেছেন চার অক্ষরের 'দূরবীক্ষণ'। অর্থাৎ প্রচলিত শব্দ উচ্ছেদের কাজ আসলে চলছে।

v) শ্যামাচরণ আরেকটি মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন বাংলায় আগত সংস্কৃত শব্দ সম্পর্কে। তাঁর ভাষায় : এ শব্দগুলো কেবল লেখায় অর্থাৎ বানানে সংস্কৃত, বলায় নয়। অর্থাৎ এগুলো ছদ্ম-সংস্কৃত মাত্র। এই শব্দগুলোর কতগুলো বাংলায় প্রচলিত ও দরকারি। আর অনেকগুলোই অদরকারি বোঝা মাত্র। তাহলে বাংলা ভাষার দিক থেকে কর্তব্য দুটো : এক. যেগুলো অদরকারি আমদানি, সেগুলো পরিহার করা, দুই. দরকারি ছদ্ম-সংস্কৃত শব্দগুলোর বাংলায় উচ্চারিত রূপকেই শুদ্ধ রূপ হিসাবে গণ্য করা। (গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৮৯)

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি আকারে-প্রকারে ব্যাপক। Appendix অংশটিও ভাষাবিজ্ঞান এবং বাংলা ভাষার গভীর অনুশীলনের স্মারক। আমরা উপরে এর সামান্য অংশই কেবল সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করলাম। কিন্তু এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে, ভাষা-পরিকল্পনা বা ভাষাচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাপেক্ষে তাঁর অবস্থান মেরুদূর। কেবল একটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের মিল পাওয়া যাবে। তা হল : অকারণে বাংলা শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার, সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কহীন বাংলা শব্দ পরিহার এবং নিষ্প্রয়োজন নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানির ব্যাপারে সংস্কৃতপন্থি লেখকদের বিরোধিতা। অবশ্য এ ব্যাপারেও শ্যামাচরণ সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক ব্যবহৃত 'অকারণ' শব্দটির প্রতি লক্ষ রেখে তিনি লিখেছেন :

> 'অকারণে' কথাটাকে আমি সম্ভাব্য সর্বাধিক প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করতে চাই। তার মানে 'মাথা'র পরিবর্তে 'মস্তক', 'পাতা'র পরিবর্তে 'পত্র' এবং 'তামা' বা 'তাঁবা'র পরিবর্তে 'তাম্র' ব্যবহারকে বঙ্কিমচন্দ্র যেসব 'কারণে' বৈধ ভেবেছেন, সে 'কারণগুলোকে' (বা যুক্তিগুলোকে) আমি যথেষ্ট মনে করছি না।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কারণ' আসলেই নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, তিনি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ না থেকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, লেখার ভাষার 'মহৎ উদ্দেশ্য' সাধন করা হুতোমি ভাষার পক্ষে সম্ভব নয়, আর 'উন্নত ও গম্ভীর' বিষয়ের উপস্থাপনায় আলালি ভাষা অক্ষম। অর্থাৎ, মিলের দিকটিতেও দুজনের মধ্যে অমিলটিই প্রকট।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে আরো কয়েকটি অংশ আছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে শ্যামাচরণের মতের অনুগামী, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বিরাট ফারাক চোখ পড়বে। আমরা একটিমাত্র উদাহরণ চয়ন করব।

বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে শ্যামাচরণ লিখেছেন :

> লেখ্য ও কথ্যরীতি নির্বিশেষে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১. সংস্কৃত-উদ্ভূত শব্দ, কিন্তু মূল থেকে এতটাই পরিবর্তিত যে, সংস্কৃত রূপ থেকে ভিন্নভাবে না লিখলে চলে না; ২. সংস্কৃত থেকে সরাসরি আগত শব্দ, যেগুলো মূল বানান ধরে রেখেছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতিতে উচ্চারিত হয়; ৩. সংস্কৃতের সাথে সম্পর্ক নাই এমন শব্দ।

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ্যটি উদ্ধৃত করছি :

> শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা, জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে শ্যামাচরণ বাবুর দোহাই দিলেও দুজনের আপাত মিলের মধ্য দিয়ে বিপুল পার্থক্যই বিশেষভাবে নজরে আসে। স্বয়ং শ্যামাচরণ এই পার্থক্যের ব্যাপারটি লক্ষ না করে পারেননি। Appendix অংশের এক জায়গায় তিনি বঙ্কিমের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন এভাবে :

> বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'জল', 'মেঘ' এবং 'সূর্য্য' প্রভৃতি শব্দ তাদের সংস্কৃত রূপ থেকে রূপান্তরিত হয় নাই। যদি শব্দগুলোর রূপ পরিবর্তিত না-ও হয়ে থাকে, অর্থাৎ এগুলোর বানান যদি অপরিবর্তিত থেকেও থাকে, ধ্বনির দিক থেকে কিন্তু শব্দগুলোর নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা 'জল' হল 'Jal' ('অ' ধ্বনি এখানে দীর্ঘ), আর সংস্কৃত 'জল' হল 'Jala' (এখানে 'অ' দ্বয় হ্রস্ব); বাংলায় 'মেঘ'-এর উচ্চারণরূপ 'Megh' (চালু বাংলায় সরলীকৃত রূপ Meg), আর সংস্কৃতে আজকাল শব্দটির উচ্চারণ 'Megha' এবং আদিতে ছিল 'Maigha'; 'সূর্য্য' বাংলায় 'Shurjjo' বা 'Shurja', যেখানে সংস্কৃতে 'Surya'।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষাচিন্তায় ধ্বনিতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। বাক্যের আলোচনায় তিনি প্রবেশই করেননি। তবে আমাদের জন্য এখানে অন্য আরেকটি দিক বেশি জরুরি। দেখা যাচ্ছে, বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেই ওরা দুজন সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় চলে গেছেন। একজন বাংলা ভাষার শব্দ ও উচ্চারণরূপকে কেন্দ্রে রেখে একটা মানদণ্ড তৈরি করতে চান, অন্যজন সংস্কৃত মানকে মডেল ধরে বাংলা শব্দ ও ধ্বনির আদর্শ রূপ স্থির করতে চান। দুজনের ভাষাচিন্তায় বেশুমার ফারাক।

প্রশ্ন জাগে, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণদের এতটা প্রশংসা করলেন কেন। কারণ বোধ করি এই যে, টেকচাঁদ ঠাকুর বা শ্যামাচরণ 'ইংরজিতে সুশিক্ষিত'। শ্যামাচরণের প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লেখা। পশ্চিমা শাস্ত্রে এবং সামগ্রিক ভাবপ্রবাহে তাঁর সহজ অধিকারের নানা চিহ্ন প্রবন্ধটিতে উপচে পড়েছে। যে রুচির অভাবহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের অনেক কবিতা সংকলনভুক্ত করতে পারেন না[২] বা সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ন্যায়রত্নকে 'শিক্ষিত' বলতে পারেন না, সেই রুচি শ্যামাচরণের লেখায় পুরাদস্তুর হাজির। তাই মতের মিল না হলেও শ্যামাচরণের প্রশংসা করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি।

৫

উপরের আলোচনা এবং 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ থেকে এবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভাষা-পরিকল্পনা' সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা যাক।

i) সমকালীন গদ্যচর্চার ধারা-উপধারা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ সরল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বিভাজনটি প্রায় জন বীম্‌স্-এর অনুরূপ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শ্রেণীবিভাগে আদালতে এবং বিষয়কর্মে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার যে প্রমাণ মিলে, বঙ্কিমচন্দ্রে তা নেই। প্রবন্ধটির গড়নশৈলীর সঙ্গে যদি এই থাকা-না-থাকাটি মিলিয়ে পাঠ করি, তাহলে বলা অসঙ্গত হবে না যে, তাঁর শেষ মধ্যপন্থার সিদ্ধান্তটি মাথায় রেখেই তিনি প্রথম থেকে পক্ষ-বিপক্ষের দ্বৈরথ সাজিয়েছেন। বলা হয়ত বাহুল্য নয়, এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই বাদ পড়েছে।

ii) বাদ পড়া বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হল মুখের ভাষা। প্রবন্ধটির নাম 'বাঙ্গালা ভাষা' হলেও আদতে লেখার বাংলাই এর একমাত্র অবলম্বন ও বিবেচ্য। প্রবন্ধের শুরুতে 'কথিত ভাষা'র প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু কথিত ভাষা বঙ্কিমের গণ্ডিতে আসে কেবল 'আলালি ভাষা' রূপে লিখিত হবার পর। যেনবা ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের কোনো 'কথিত ভাষা' নেই, তারা বইয়ের ভাষা থেকেই কথা বলতে শেখে। আসলে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিকে 'বাংলা ভাষা' বিষয়ক প্রবন্ধ হিসাবে বিবেচনা করার আজতক চালু প্রবণতাটিই একটি বিরাট গলদ। 'বাঙ্গালা ভাষা' শুধু 'সাহিত্যিক বাংলা ভাষা' বিষয়ক প্রবন্ধ।

শ্যামাচরণের প্রবন্ধের নাম স্মরণে রাখলে আমরা এই সীমাবদ্ধতা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারব। প্রথমে মুখের ভাষা, তারপর লেখার ভাষা। শ্যামাচরণ কিংবা অন্য কেউ নিশ্চয়ই দাবি করবেন না যে, লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা একই বস্তু। কিন্তু দুইয়ের পার্থক্য যেন কম হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা তো ভাষা ব্যবহারকারীর প্রাথমিক কর্তব্য। আর, যেমনটা শ্যামাচরণ লিখেছেন, ভাষা-পরিকল্পনাকারীদের মনে রাখা দরকার, লেখার ভাষা নয়, মুখের ভাষাই হবে মূল বিবেচ্য। প্রথম ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সায় অবশ্য তাঁর রচনা থেকে খুঁজেপেতে বের করা যাবে। কিন্তু 'কথিত ভাষা'কে বিবেচনার কেন্দ্রে রাখা তো দূরের কথা, বিবেচনার গণ্ডিতে আনার কোনো লক্ষণও বঙ্কিমচন্দ্রে নেই।

iii) সংস্কৃত শব্দ আমদানির দায় পুরোপুরি সংস্কৃতশিক্ষিত পণ্ডিতদের ঘাড়ে চাপিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষ্য তৈরি করেছেন। তাঁর নিজের রচনায় সংস্কৃত শব্দ ও শৈলীর চাপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রামগতি ন্যায়রত্নের তুলনায় মোটেও কম নয়। বোঝা যায়, সংস্কৃত শব্দপ্রীতিতে মূল বিরোধ নয়, বিরোধের মূলে আছে ক্ষমতা-অক্ষমতার প্রশ্ন।

তাছাড়া উনিশ শতকের গদ্যে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর প্রতিষ্ঠার দায় থেকে অন্তত দুটি পক্ষকে বঙ্কিম দৃষ্টিকটুভাবে রেয়াত দিয়েছেন। একপক্ষে আছেন জোনাথন ডানকান, নিল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন, হেনরি পিটস ফরস্টার, নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, জর্জ চার্লস মেয়ার, উইলিয়াম কেরি প্রমুখ ইউরোপীয় লেখক, যাঁরা অনুবাদ, গদ্যরচনা, ব্যাকরণ প্রণয়ন কিংবা অভিধান সংকলনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতায়নের আদিকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন (মুরশিদ ১৩৯৯), আর অন্য পক্ষে আছেন ইংরেজি-শিক্ষিত উন্নাসিক বাঙালি গোষ্ঠী, যাঁদের পরিচয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বরাতে আমরা আগেই দিয়েছি।

বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনের কর্তাপক্ষ ও সহযোগী পক্ষের কোনো উল্লেখই 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে নেই। আছে বেশ সরল একটা বিবৃতি : সংস্কৃতপন্থি পণ্ডিতরাই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে গৌরববোধ করেন। আদতে সেকালের ভাষাপরিস্থিতি এত সরল ছিল না। অবস্থাবৈগুণ্যে নানাপক্ষ বাংলা ভাষাটাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালাই করে নতুন করে গড়তে চাইছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতরা সেই অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র।

iv) শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির প্রশংসা করলেও ভাষাপ্রশ্নে তাঁর সঙ্গে শ্যামাচরণের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিপুল। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ থেকে এমন একটা ধারণা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক যে

টেকচাঁদ ঠাকুরের গদ্যচর্চা আর শ্যামাচরণের প্রস্তাব একই ঘরানার। কিন্তু আদতে তা নয়। প্যারীচাঁদের উদ্যোগে ও রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা'র ঘোষণাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইয়াছে। যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই'। (উদ্ধৃত, চৌধুরী ২০০৩ : ৬৩) সর্বজনপাঠ্য হবার এই আকাঙ্ক্ষা ভাষার বিবেচনায় বৈপ্লবিক। সেই বিপ্লবে কামিয়াব হওয়ার কোনো শর্তই সেকালের কলকাতায় ছিল না। তাই দেখি, প্যারীচাঁদ পরবর্তী আর কোনো 'উপন্যাস' আলালি ভাষায় লেখেননি। কিন্তু 'মাসিক পত্রিকা' বা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্যারীচাঁদ মিত্র যে ভাষা প্রস্তাব করেছেন, তার সাথে শ্যামাচরণ বা পরবর্তীকালের একই ঘরানার ভাষাচিন্তকদের প্রস্তাবকে গুলিয়ে ফেলা বেশ বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তি বঙ্কিমে তো আছেই, এমনকি পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলোচকের মধ্যেও প্রবলভাবে বিদ্যমান। শ্যামাচরণরা এক ধরনের 'প্রমিত' বা 'মান' বাংলাই চেয়েছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল : এক. বাংলার বিপুল উপভাষাগত বৈচিত্র্যকে আমলে এনে 'মান' বাংলা গড়ে তোলা, দুই. ভদ্রলোকশ্রেণীর মুখের ভাষাকে বাংলা লেখ্য ভাষা ও ব্যাকরণের ভিত্তি হিসাবে নেয়া। একে 'আলালি ভাষা'র সঙ্গে এক কাতারে শামিল করার সুযোগ নেই।

v) 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জোরালো প্রতিফলন আছে। কিন্তু এই উপযোগবাদের পরিসর বেশ সংকীর্ণ। আগেই বলেছি, লিখিত ভাষাই তাঁর বিবেচনার ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র আবার কেবল ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত। ভাষার যে আরো দশ রকমের ব্যবহার আছে – জনশিক্ষায়, অফিস-আদালত-কোর্ট-কাছারিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে – তার সবকিছুই এই বিবেচনার বাইরে থেকে গেছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লক্ষ করেছেন, সর্বজনপাঠ্য হবার যে সাধনা 'মাসিক পত্রিকা'র ছিল, উত্তরকালীন হয়েও 'বঙ্গদর্শন' তেমন দাবি করতে পারেনি, বরঞ্চ আশা করেছে যে সে 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী হবে'। (চৌধুরী ২০০৩ : ৬৩) বিদ্যাসাগরের তুলনায় বঙ্কিমের রাস্তা প্রশস্ত; কেননা সেখানে এসেছে হৃদয়াবেগের পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পসৌন্দর্যের মনোহারিত্ব। (চৌধুরী ২০০৩: ৫৮) অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধি যেমন সাহিত্যিক গদ্যে, পরিকল্পনাটাও ঠিক তেমনি সাহিত্যিক ভাষাকে ঘিরেই।

এই ভাষা-পরিকল্পনার বিশিষ্টতা, সীমাবদ্ধতা ও দ্বিধার উৎস ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামো – তার সংকীর্ণ শ্রেণীগড়ন ও জনবিচ্ছিন্নতা।

৬

ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই যে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছিল, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।[৩] নতুন গদ্যে শব্দভাণ্ডারের পরিবর্তনটাই ছিল সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আলোচনায় শব্দসম্ভার নিয়েই নীরত ছিলেন। এ বিষয়ক সেকালের অন্য রচনায়ও শব্দই ছিল মূল বিবেচ্য। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভাব খুব গভীরভাবে কাজ করে গেছে বাক্যের গড়নেও। আগে বাক্য লেখা হত খাট

দৈর্ঘ্যের, সরল প্রকৃতির।[৪] কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার নানা প্রভাবে বাংলা গদ্যের এই সরলতা দ্রুত লোপ পেতে শুরু করে। সরল ও খাট বাক্যের বদলে জটিল ও দীর্ঘ বাক্য লেখার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। (মুরশিদ ১৩৯৯ : ১৭৮)

বস্তুত দীর্ঘ বাক্যের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য বা সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে লম্বা বাক্যগড়ন একসূত্রে গাঁথা। জটিল-অচলিত-দীর্ঘ তৎসম শব্দের, বিশেষত, সমাসনিষ্পন্ন শব্দের ছন্দময় সংস্থানের জন্য বাক্যের প্রশস্ত পরিসর অপরিহার্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য পরীক্ষা করলেই আমরা একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। অবশ্য বাংলা বাক্যের নতুন রূপে ইংরেজি বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবও ক্রিয়াশীল ছিল।

হ্যালহেড থেকে শুরু করে উইলিয়াম ক্যারি পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিদেশি বিশারদদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতেন যে বাংলা সংস্কৃতের সন্তান এবং অ-সংস্কৃত উপাদান বাংলা ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট করছে। সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত-মুন্সি এবং পরবর্তী লেখকরাও এ ব্যাপারে নিঃসংশয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত'। দেখা যাচ্ছে, ভাষার শুদ্ধতা সম্পর্কে সংস্কৃতপন্থিদের মতো অনড় মত পোষণ না করলেও বাংলা ভাষার উৎস সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত মোটামুটি একই ছিল। গোটা উনিশ শতক জুড়ে কলকাতায় বাংলা ভাষার চর্চাকারী এলিট অংশটি এই মনোভাব থেকেই বাংলা গদ্য তৈরি করে যাচ্ছিল। তবু, এসব তথ্য থেকে বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নের পুরা প্রক্রিয়া কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে, সে সময়ের সমাজে, বিশেষ করে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে নিশ্চয়ই এমন কোনো একটা ঘটনা ঘটে থাকবে – সমষ্টিগত মনোভাবের এমন কোনো পরিবর্তন, যা এই ব্যাপক সংস্কৃতায়নের জন্য দায়ী। (মুরশিদ ১৩৯৯ : ১৮৬-৮৭)।

গোলাম মুরশিদ এই পরিবর্তিত মনোভাবের কয়েকটি কারণ ও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, মুসলিম শাসনের পরিবর্তে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়াই সংস্কৃতায়নের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম শাসনের চাপ না থাকায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়। এই শব্দগুলোর স্থান দখল করে সংস্কৃত শব্দ। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পেছনে গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ভারতের একটা ধারণা কাজ করেছিল। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের পরিশ্রমী চর্চা ও কৌতূহল এই ধারণা তৈরি হওয়ার বড় কারণ। জনপ্রিয় লৌকিক রীতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ও সংস্কৃত সাহিত্যের সাহচর্য-ধন্য এক ধ্রুপদী রীতির প্রতিষ্ঠা নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এসবকিছুরই অনিবার্য পরিণতি ছিল সংস্কৃতায়ন।

উনিশ শতকের প্রথমাংশে দেখি সাহেব ও ব্রাহ্মণদের ভেতর, ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভেতর, এক কার্যকর আপোসরফা। ইংরেজদের দিক থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতরা যেমন বাংলা ভাষার সাহেববোধ্য রূপের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিন্দু ব্রাহ্মণদের দিক থেকে সাহেবরা হয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণদের 'লুপ্ত গৌরব' পুনরুদ্ধারের মাধ্যম। (রায় ১৯৯০ : ৭২) সংবাদপত্রে, সাহিত্যিক ও কেজো গদ্যে কিংবা অভিধান ও ব্যাকরণে এসময় দেখা যায়, জনপ্রচলিত শব্দ ও বাগবিধির পরিবর্তে ব্যাপক হারে প্রবেশ করছে সংস্কৃত শব্দ ও বাগবিধি, আর বাক্যের গড়ন ও ভাষার আর্থস্তরে জেঁকে বসছে

ইংরেজির প্রভাব। 'আধুনিক' বাংলা গদ্যের জন্মদশার এই ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরোমাত্রায় সচেতন ছিলেন। 'ভাষার কথা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক। ... তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে, কিন্তু গতি নাই।' এর মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের মাঝামাঝি তক দাঁড়িয়ে যায় বাংলা গদ্যের এক নিরূপিত 'উচ্চ' রূপ।

বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে সেই গদ্যের মহত্তম কারিগর ও শিল্পী। তাঁর কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের যে রূপরীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তার ভিত্তির উপরই তিনি নির্মাণ করেছিলেন বহুমহলা প্রাসাদ। কী প্রকাশ করেছিলেন তিনি এই প্রকাশক্ষম গদ্যে?

কলকাতায় উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া উনিশ শতকের গোড়াতেই নানা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করেছিল। কিন্তু ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ইংরেজি-শিক্ষিত আর ইংরেজ-শাসনের সহায়ক বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হয়েছেল গভীরতর অর্থে 'ঔপনিবেশিক মন'। (দ্রষ্টব্য : রায় ১৯৯১, চ্যাটার্জি ১৯৯৩, নন্দী ১৯৮৯, চৌধুরী ১৪০৮ ইত্যাদি) বঙ্কিমচন্দ্র এই অবস্থা সম্পর্কে বিলক্ষণ সতর্ক ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে তিনি যে লিখেছিলেন – 'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি। ঈশ্বরগুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই' – তা ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় তৈরি নতুন বাঙালির খাঁটি বাস্তবতা। শতাব্দীর প্রথমাংশে যে বাঙালি অশ্লীলতা-বিদ্রূপ-প্যারোডি হজম করে নিচ্ছিল ঈশ্বরগুপ্ত বা আলাল-হুতুমের কবিতা-গদ্যে, সেই বাঙালিরই পরিবর্তিত মন-মেজাজ-রুচিকে বরাভয় দিতে আবির্ভূত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। জনতার সঙ্গে ঐ শিক্ষিত ভদ্রগোষ্ঠীর দূরত্ব বেড়েই চলছিল। তারা চারপাশের 'সাধারণ' মানুষের বহুকণ্ঠস্বর আর শুনতেই চাইছিল না। তার বদলে কান অপেক্ষা করছিল একস্বরের, মহৎ কোনো একস্বরের। ঠিক সেই সময়ই 'নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন'। (রায় ১৯৯১ : ১১-১২)

দেবেশ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রের বরাত দিয়ে দেখিয়েছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' একই সঙ্গে শিক্ষিত তরুণ ও প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিতকে মুগ্ধ করেছিল। এই মুগ্ধতার গোড়ায় আছে উপন্যাসটির কাহিনী ও ভাষা। কাহিনীটি বর্তমান থেকে দূরবর্তী, ইতিহাস ও রোমাঞ্চের মোড়কে ঢাকা; আর ভাষা তৎসমশব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, বিশেষণবাহুল্য ও প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদে সংস্কৃত ছাঁদের দারুন সমাহার। সেকালের ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় এরকমই হওয়া সম্ভব ছিল। কারণ, 'An elitism now becomes inescapable. Because the act of cultural synthesis can, in fact, be performed only by a supremely cultivated and refined intellect. It is a project of national-cultural regeneration in which the intelligentsia leads and the nation follows। (চ্যাটার্জি ১৯৯৩ : ৭৩) বঙ্কিম নিঃসন্দেহে এই elit intelligentsia কুলের শিরোমণি। আর দশ অবস্থানের মতো ভাষাপ্রশ্নে তাঁর অবস্থানকেও ব্যক্তিগতভাবে না দেখে শ্রেণী আকারেই দেখতে হবে। পশ্চিমের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মের যোগসাধন আর এর মধ্য দিয়ে

ভারতীয়দের মধ্যে আদতে পশ্চিমকেই মূর্ত দেখতে চাওয়ার যে অভিলাষ সেকালের প্রধান ভাবুকদের মধ্যে দেখি[৫], বঙ্কিমের সমগ্র সাধনা তারই সারাৎসার। উপনিবেশের সমাজ এবং নব্য বাঙালির ছোট্ট গোষ্ঠীটাকে না বুঝলে এই অভিলাষের মর্ম বোঝা যাবে না।

বঙ্কিমের পক্ষে তাই আলালি-হুতোমি ভাষাকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের বা শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির তিনি প্রশংসা করেন। কারণ, সেখানে ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি জ্ঞানের বরাত আছে। কিন্তু তাঁর নিজের ভাষাপরিস্থিতি ও শ্রেণীপরিস্থিতি তাঁকে তাঁদের মতে স্থিত হতে দেয় না। সংস্কৃত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের তিনি নিন্দা করেন। কারণ, নতুন যুগের নতুন ভাবপ্রবাহে তিনি অচল। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রচণ্ড চাপে সংস্কৃত-স্কুলের সঙ্গেই তাঁর যোগ বজায় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মধ্যপন্থা' তাঁর বা তাঁদের মধ্যপন্থাই বটে, বাংলা ভাষার নয়।

৭

বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা গদ্য নানা ধরনের সৃজনশীল-মননশীল তৎপরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। গদ্যে রীতির বা রূপের পরিবর্তনও বড় কম হয়নি। চলিত বাংলার[৬] প্রচলন, নতুন শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি আত্মসাৎ করে নেয়া, আর প্রধানত উপন্যাসের প্রয়োজনে প্রান্তজনের জীবনকথা রূপায়ণের স্বার্থে প্রান্তজনের ভাষার দ্বারস্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য নিজের সীমা অনেকদূর বাড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু ভাষার বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আজো এমন কোনো পরিস্থিতির দেখা পাওয়া যায়নি, যাতে করে বলা যাবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে বিদ্যমান ছক থেকে আমরা পরিবর্তিত কোনো ছকে উন্নীত হয়েছি। গদ্যের গতি আজো উপর থেকে নিচের দিকেই চলছে, নিচ থেকে উপরে ওঠার কোনো লক্ষণ তাকে নতুন মহিমা দেয়নি। মুখের ভাষাকে বা জনপ্রচলিত ভাষাকে মূল ধরে ভাষা-পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি, উপভাষাগুলোকে যথাসম্ভব আত্মসাৎ করে নিয়ে 'প্রমিত' ভাষার শক্তি ও সীমা বাড়িয়ে নেয়ার উদ্যোগও দেখা যায়নি। উপনিবেশ আমলের ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ফুলে-ফেঁপে অনেক বড় হয়েছে; কিন্তু সংকীর্ণ রক্ষণশীলতা আর জনবিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পায়নি।

সম্ভবত এই কারণেই ভাষাপ্রশ্নে বঙ্কিমের অবস্থানকে পরবর্তীকালের অনেক ভাষাবিশ্লেষক 'মধ্যপন্থা' বলেই মেনে নিয়েছেন। তাঁদের আলোচনায় আমরা পুরোনো প্রতিষ্ঠিত ছককে মেনে নেয়ার প্রবণতাই দেখতে পাব। পবিত্র সরকার লিখেছেন : 'এই ['বাঙ্গালা ভাষা'] প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী একটি বাংলা শৈলীর সন্ধান করেছেন।' (সরকার ১৯৯৯ : ২৪) বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন a literature for the people of bengal – এই মত সমর্থন করে পবিত্র সরকার লিখেছেন: 'এই People কারা, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুনির্ণীত ছিল। তাঁরা হলেন কারিগর ও দোকানিরা, গ্রামের জমিদার ও মফস্বলের উকিল সম্প্রদায়, অফিসের অধস্তন কর্মচারীর দল, আর যে-অসংখ্য মানুষ মাতৃভাষার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চলেছেন তাঁরা'। (সরকার ১৯৯৯ : ২১)

এই উদ্ধৃতিতে সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের কৃষকের কথা নেই, কিন্তু জমিদারের কথা আছে। জমিদার তো গ্রামে ছিল না, ছিল শহরে। অফিসের অধস্তন কর্মচারীর দল বঙ্কিমচন্দ্রের 'পাঠক-People' ছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু 'কারিগর ও দোকানি'দের উল্লেখ যে এখানে একটি

অপপ্রয়োগ, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের People সন্দেহাতীতভাবে এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী – নগরকেন্দ্রিক – ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বে যার জন্ম। ১৯৪৪ সালে বিনয় সরকার মন্তব্য করেছিলেন : বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সাকুল্যে 'লাখ-তিনেকের জীবনকথা' চর্চিত হয়। (সরকার ২০০৩ : ৭৩৫) বঙ্কিমের সময়ে এ সংখ্যা যে আরো ক্ষুদ্র ছিল – তা বলাই বাহুল্য। এই অতিক্ষুদ্র শ্রেণীকে People বলে চালানো অন্য অনেক কিছুর (রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, উন্নতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি) মতো বাংলা ভাষারও মূল সংকট বলে আমাদের ধারণা।

গোলাম মুরশিদ 'উপনিবেশ' শব্দটিকে একটি সর্বগ্রাসী গভীর প্রক্রিয়া হিসাবে না দেখে দেখেছেন পরিবর্তিত সময়কাল হিসাবে এবং বিশেষত শাসকশ্রেণী ও শাসনপ্রক্রিয়ার পরিবর্তন হিসাবে। তাছাড়া, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ভাষাপরিস্থিতির যে রূপ দাঁড়িয়েছে, তার প্রতি নিজের সমর্থনও তিনি গোপন করেননি। তাই ভাষার গুরুতর পরিবর্তনগুলো তিনি উল্লেখ করলেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারেননি। যেমন, লিখেছেন: 'সংস্কৃতায়নের ফলে বাংলা গদ্যে কৃত্রিমতা দেখা দেয় এবং তা মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে যায় – এ কথা সত্য হলেও সংস্কৃতায়নের ইতিবাচক দিকগুলোও অনস্বীকার্য। ... এই প্রক্রিয়ার শেষে বাংলা ভাষা সকল প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত হয়ে এক বিদগ্ধ ও প্রামাণ্য ভাষায় পরিণত হয়'। (মুরশিদ ১৩৯৯ : ২০৩) এখানে 'কৃত্রিমতা' ও 'মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে' যাওয়ার ভয়াবহতা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে।[৭]

আসলে মুখের ভাষা থেকে দূরে সরে গিয়ে কৃত্রিম হয়ে উঠাই ছিল এ গদ্যের অনিবার্য নিয়তি। কর্তা শ্রেণীটির জনবিচ্ছিন্নতা এর কারণ। জনপ্রচলিত ভাষার সঙ্গে লিপ্ত থাকার কোনো দায়বোধ এই শ্রেণীর ছিল না। তাই আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লোক-প্রচলিত বাংলা শব্দ, বাগধারা-বাগবিধি ও উচ্চারণভঙ্গি লেখ্য বাংলার গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে এদের কোনো অসুবিধা হয়নি। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে লোকের মুখে মুখে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দগুলো পরিহার করার ইতিবৃত্ত এ প্রসঙ্গে পুনঃপরীক্ষাযোগ্য। এর গভীরে শ্রেণীগত ব্যাপার ক্রিয়াশীল ছিল, যদিও তার চেহারা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল সাম্প্রদায়িক। এর কারণ ভদ্রলোকেরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু, এবং বাতিল শব্দগুলোর অধিকাংশই ছিল মুসলমান শাসনের স্মারকচিহ্ন। (চৌধুরী ২০০৩ : ৮৩)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবুবিলাস'-এ (১৮২৩) ভদ্রলোকদের পক্ষে পরিত্যাজ্য একটা শব্দতালিকা দিয়েছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন : '১৮২ শব্দের এই তালিকায় অধিকাংশ শব্দই নিরীহ ও বহুলপ্রচলিত, যেমন, আসল, আইন, আজ, অবস্থা, কাল, কলম, কামরা, কায়দা, কাঁচা, ... তাগাদা, তামাসা, তাজ্জব, ফরসা, ভোর, রকম ইত্যাদি। (চৌধুরী ২০০৩ : ৯৪)

কিন্তু এটি প্রকৃত ঘটনার কিয়দংশ মাত্র। আসলে লোকমুখে প্রচলিত বিপুল পরিমাণ অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি শব্দ আর ক্রিয়াপদও বাদ পড়েছিল আরবি-ফারসির সাথে সাথে। আরবি-ফারসি শব্দগুলো মূল ভাষার শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনিসংস্থান হারিয়ে অনেকদূর পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার অতৎসম বা তদ্ভব শব্দের ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি রূপে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের পণ্ডিতরা এসব শব্দকে কেবল বিচ্ছিন্ন উপাদান হিসাবেই দেখেছেন। মুখের ভাষায় একটি শব্দের দীর্ঘকালীন ব্যবহার তার আশপাশটায় এবং নিজ শরীরে যে পরিবর্তন সাধন করে তা খতিয়ে দেখেননি। আমরা এখানে

কেবল এটুকু বলতে চাই যে এগুলো লোকমুখের বাগবিধি ও ভাষার অন্তর্গত বাগধারা আকারে কেবল শব্দরূপে নয়, ভাষার আঙ্গিকরূপেও ভাষাশরীরে সন্নিবিষ্ট ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। ঐ পুরো বাগবিধি বদলে না ফেলে এই শব্দগুলো পরিহার করা সম্ভব ছিল না।

তাই আরবি-ফারসি শব্দ পরিহারের ব্যাপারটিকে গদ্যভঙ্গির পরিবর্তন, মুখের ভাষা থেকে দূরবর্তী অবস্থান গ্রহণ এবং সামগ্রিকভাবে লোকরুচি ও স্বভাবের বিপরীতে অন্যতর 'কিছু একটা' সৃজনের বৃহৎ আয়োজনের অংশ হিসাবে পাঠ করলেই অন্তত ভাষা ও গদ্যের আলোচনায় যথোচিত গুরুত্ব দেয়া হবে। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এধরনের বিস্তর নমুনা চয়ন করেছেন। যেমন, একজন খুব খ্যাতিমান লেখক প্রচলিত 'লোপা' শব্দটি এড়ানোর জন্য লিখেছিলেন 'উৎক্ষেপ করিয়া পুনরায় হস্তে গ্রহণ করা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাষা-আলোচনার নানা জায়গায় এরকম অসংখ্য উদাহরণ সংকলন করেছেন। যেমন : " 'মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে' একথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয়। কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে। যদি দেখা যায় অত্যন্ত নির্জলা খাঁটি পণ্ডিত মশায় ছেলেটার ষত্ব-ণত্ব শুদ্ধ করবার জন্য তাকে বেদম মারছেন, তাহলে বলে থাকি 'আহা বেচারাকে মারবেন না'। যদি বলি 'নিরুপায় বা নিঃসহায়কে মারবেন না' তাহলে পণ্ডিত মশায়ের মনেও করুণরসের বদলে হাস্যরসের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। ... বদমায়েশকে দুর্বৃত্ত বললে তার চোট তেমন বেশি লাগবে না। এই শব্দগুলো যে এতো জোর পেয়েছে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে যোগ হয়েছে।"

হুমায়ুন আজাদ জন বীম্‌স্ ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'দল-বিভাজন' মেনে নিয়েছেন আর বঙ্কিমচন্দ্রকে বর্ণনা করেছেন আপোসপন্থি হিসাবে। পূর্ববর্তীদের মতো তিনিও শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ও হরপ্রসাদশাস্ত্রীকে বলেছেন 'বাংলাপন্থি' আর শরচ্চন্দ্র ও সতীশচন্দ্রকে বলেছেন 'সংস্কৃতপন্থি'। তাঁর মতে দুই পক্ষই চরমপন্থি – একপক্ষ 'লৌকিক বাংলার শহীদ'। অন্যপক্ষ 'সংস্কৃতের যূপকাঠে আত্মোৎসর্গকারী'। এই দুই চরমপন্থার একটিও বাংলা ভাষা মেনে নেয়নি, তা বয়ে চলেছে মধ্যস্রোতে। (আজাদ ২০০২ : ৫৬-৫৭)।

আজাদের এই বর্ণনা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মধ্যপন্থাকে সরলভাবে মেনে নেয়ার দৃষ্টান্ত। আদতে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা কস্মিনকালেও বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক বা বাংলায় সংস্কৃত শব্দের ঋণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল দুটো; এক. যে শব্দ বাংলায় আছে, তা সংস্কৃত থেকে আমদানি করা যাবে না, দুই. সংস্কৃতের উপর বাংলাকে এমন কোনো ব্যাপারে নির্ভরশীল করা যাবে না যাতে করে বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।(দ্র. গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৮৯, শাস্ত্রী ২০০০) 'আধুনিক' ভাষাবিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা বা চর্চা কি আছে, যা এই দুই দাবির বিপরীত কিছু প্রত্যাশা করে? বলা বাহুল্য এপ্রশ্নের জবাব না-বাচক হতে বাধ্য। তবুও ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'বাংলাপন্থি' না হয়ে 'মধ্যপন্থি' হওয়ার কারণ কী?

আবার আমরা ভাবতে বাধ্য হই, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে যেমন ঠিক তেমনি আজকের দিনেও আমাদের ভাষা-বিবেচনাটা কেবল লেখ্য বাংলা নিয়ে, কিংবা বড়জোর ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোয় সুবিধাভোগী একটা ছোট্ট গোষ্ঠীর তৈরি করা ভাষা নিয়ে। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভাষার গণতন্ত্রায়নের ব্যাপারটা, উঠে আসে অধিপতি শ্রেণীর আর দশ জিনিসের মতো ভাষারও দখল নিয়ে

নেয়ার বাস্তবতা। বস্তুত 'অভিজাত শ্রেণী (বা শাসকেরা) নিজেদের স্বার্থে পরিকল্পনা করে বটে, কিন্তু তাতে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যই শুধু সিদ্ধ হয় না, জনসাধারণও তার ফল ভোগ করে থাকে।' (দ্র. কুপার ১৯৮৯, উদ্ধৃত, নাথ ২০০৩ : ৪৫৩) বাংলাভাষীরা এর কুফল নিয়তই ভোগ করছে। প্রমিত বা মান ভাষার ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মুখের ভাষা থেকে অনবরত শব্দ ও অন্য উপাদান শোষণ করে করে ভাষা তার পুষ্টি সাধন করবে, আর দশের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দশের ব্যবহার-উপযোগী হয়ে উঠবে। তা না করে 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করা হয়েছে এমন এক লিখিত ভঙ্গির, যা উনিশ শতকের গোড়ার অস্বাভাবিক ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির ফল। সাহিত্যিক বা সাহিত্যপাঠক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় নিজের শৈল্পিক-আত্মিক প্রয়োজনে সেই ভাষার নানা রূপ-রূপান্তর ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু কখনো আর জনতার কাছে ফিরে যায়নি। একারণেই দেখা যাবে, তথাকথিত মধ্যপন্থিরা সবসময়ই সাহিত্যের দোহাই দিয়েছে; শৈলী, রুচি ও সামাজিক সমৃদ্ধির বাহানা পেড়েছে; বিপরীতে কথিত বাংলাপন্থিরা গুরুত্ব দিয়েছে জনশিক্ষা বা শিশুশিক্ষার উপর। তাঁদের তীক্ষ্ণ খেয়াল ছিল ভাষার ব্যবহার-উপযোগিতা ও জনসংশ্লিষ্টতার প্রতি।

হুমায়ুন আজাদ তাঁর মধ্যপন্থিদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও নিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গদ্যে যাই হোন না কেন, ভাষা-বিষয়ক রচনাবলিতে মোটেই 'মধ্যপন্থি' নন, বরং খাঁটি 'বাংলাপন্থি'। তাঁকে বরং 'প্রাকৃতপন্থি' বলাই ভালো। বহুবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: 'যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়।' এ কেবল তাঁর কথার কথা নয়। তাঁর বিপুল-গভীর[৮] ভাষাচর্চার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা ভাষার 'বাংলাত্ব' আবিষ্কার করা। অবশ্য গোড়াতে তিনিও সংকীর্ণ 'মধ্যপন্থা'য় আস্থাবান ছিলেন। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ছোটবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। সেই জন্য ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এই কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই সাহিত্য-ভাষার পথটা এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যভাষার সরু পথই নির্দেশ করেননি, বিপরীতে কী হতে পারত বা কী হওয়া উচিত তারও দিশা দিয়েছেন :

> যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত।

তিনি নিজে সে কাজ শুরু করেছিলেন। অনেকদূর এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু তাঁর পর সে কাজ আর এগোয়নি। আশঙ্কা হয়, 'প্রাকৃত বাংলা ভাষার চওড়া বহরে'র সঙ্গে মেলানোর আগ্রহ না থাকায় কিংবা মেলানোর পরিশ্রমসাধ্য জটিলতা এড়ানোর জন্যই আমাদের পরবর্তী ভাষাবিশ্লেষকরা পুরোনো ছকের নিরাপদ 'মধ্যপন্থা'য় থিতু থাকতে চেয়েছেন।

বাংলা ভাষার খাঁটি ব্যাকরণ আজো রচিত হয়নি। প্রমিত বা মান বাংলা ভাষার রূপ নির্মাণের কাজ বেশিদূর এগোয়নি। শেষ করা যায়নি বাংলা বানান-সমন্বয়ের কাজও। বাংলা ভাষাকেন্দ্রী গত দুশ বছরের এসব প্রধান সমস্যার গোড়া পোঁতা আছে তথাকথিত 'মধ্যপন্থা'য়।

টীকা

১ শ্যামাচরণের রচনাটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। Appendix ও Note বাদ দিয়ে মূল প্রবন্ধটি সম্প্রতি ছাপাও হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা : শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহাম্মদ আজম অনূদিত, জাতীয় সাহিত্য, সম্পাদক: সাখাওয়াত টিপু, ১লা কিস্তি, জানুয়ারি ২০০৮)

২ বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমি ভাষাকে 'অশ্লীল' অভিধায় বর্জন করেছেন। এই অশ্লীলতার স্বরূপ কী? অন্যত্র ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে করা মন্তব্য থেকে এর তাৎপর্য সন্ধান করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন : 'ঈশ্বরগুপ্ত সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা অশ্লীল'। গুপ্তের কবিতায় ব্যাপক কাটছাঁট করে বঙ্কিম নির্মাণ করেছেন 'একালে'র রুচিসম্মত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ'। স্পষ্টতই এই রুচি সেকেলে বাঙালির বিপরীত বস্তু। উপনিবেশের ঔরসে, অভিভাবকত্বে এক গভীর-জটিল-দীর্ঘমেয়াদি উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই বস্তু তৈরি হয়েছে। 'বাঙালি জীবনে রমণী' গ্রন্থে নীরদচন্দ্র চৌধুরী নতুন এই রুচি ও 'শ্লীলতা'র কৌতূহলোদ্দীপক বয়ান তৈরি করেছেন।

৩ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আগের চর্চাও মুখ্যত ইংরেজদের হাতেই হয়েছিল। পরের চর্চায় যেখানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছিল না, সেখানেও ছিল ছাঁচের বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। পুরানা দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে যে-বিপুল বাংলা গদ্যের দেখা মিলে, পরবর্তী গদ্যচর্চায় তার প্রভাব পড়েনি বললেই চলে। (দ্র. মুরশিদ ১৩৯৯, রায় ১৯৯০)

৪ অন্য কারো কারো মতো বিনয় সরকারও লক্ষ করেছেন : খাঁটি বাংলা বাক্য হয় ছোট বহরের, আট-দশ-বারটা শব্দে। (সরকার ২০০৩ : ১০০)

৫ বিষয়টি বহুল প্রচারিত। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় : The west has a superior culture, but only partially; spiritually, the East is superior. What is needed, now, is the creation of a cultural ideal in which the industries and the sciences of the west can be learnt and emulated while retaining the spiritual greatness of Eastern culture. (চ্যাটার্জি ১৯৯৩ : ৭৩)

৬ চলিত বাংলা কতটা চলতি সে প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক। সুধীন দত্তের গদ্য কিংবা ঢাকার ষাটের দশকের অতি জটিল সংস্কৃত-ভারাক্রান্ত গদ্য চলিত রীতির নামেই চর্চিত হওয়ায় এ প্রশ্ন আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

৭ দেবেশ রায়ও লক্ষ করেছেন : মাত্র সোয়াশ বছরে বাংলা গদ্যের ধারণক্ষমতা, নমনীয়তা, রূপবৈচিত্র্য এমন যে মনন ও কল্পনার, অনুভব-উপলব্ধির ভুবনের কোনো কিছুই তার প্রকাশক্ষমতার অতীত নয়।

একই সাথে তিনি এও খেয়াল করেছেন : কর্মের বৈচিত্র্যে ব্যবহৃত হলে ভাষায় যে-বৈচিত্র্যের ধারা আসে, যাঁরা সে ভাষায় কথা বলেন তাঁদের সকলের আত্মসম্মানের সঙ্গে জড়িত হলে ভাষার যে-নিশ্চয়তাবোধ আসে, সকলের পক্ষে বিকল্পহীন হলে ভাষার যে বহুলতা আসে – বাংলা গদ্যভাষা তার সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। (রায় ১৯৯০ : ৩-৪)

৮ একজন উঁচু মাপের ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে, বিশেষত বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর ভাষাচর্চা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে – এমন বলা যাবে না।

পুস্তক-তালিকা

আজাদ ২০০১ : বাঙলা ভাষা, ২য় খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আজাদ ২০০২ : বাঙলা ভাষা, ১ম খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

চৌধুরী ১৪০৮ : বাঙালী জীবনে রমণী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, চতুর্দশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

চৌধুরী ২০০৩ : উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

চ্যাটার্জি ১৯৯৩ : Nationalist Thought And The Colonial world, Partha Chatterjee, Second impression, University of Minnesota press, Minneapolis

নন্দী ১৯৮৯ : The Intimate Enemy, Ashis Nandy, Second Impression, Oxford University Press, Delhi

নাথ ২০০৩ : উনিশ শতকে বাঙালির বাংলা ভাষা চর্চা : ঔপনিবেশিকতার ব্যাকরণ এবং, মৃণাল নাথ; স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থভুক্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, রামগতি ন্যায়রত্ন, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নতুন সংস্করণ, সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা

মুরশিদ ১৩৯৯ : কালান্তরে বাংলা গদ্য, গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

রায় ১৯৯০ : উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য, দেবেশ রায়, প্যাপিরাস, কলকাতা

রায় ১৯৯১ : উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শাস্ত্রী ২০০০ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), ২য় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

সরকার ১৯৯৯ : ভাষামনন : বাঙালি মনীষা, পবিত্র সরকার, ২য় সংস্করণ, পুনশ্চ, কলকাতা

সরকার ২০০৩ : বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিমরচনাবলি, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্ররচনাবলি, বিশ্বভারতী, কলকাতা

পত্রিকার তালিকা

গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৮৯ :Bengali Spoken and Written, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা আকাদেমি পত্রিকা ৩ (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি), কলকাতা